

ড. সুলতান মাহমুদ রানা >

“বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথও নিরাপদ নয়!”

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত আলোচিত। কারণ শিশু থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই এখন নিরাপত্তার সংকটে। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত সংঘাতে দেশে হত্যা ও বর্বরতার মাত্রায় শিশুহত্যা ও নির্যাতনের প্রসঙ্গটি সব সময়ই আমাদের সামনে থেকে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের অনেক শিশুহত্যা ও নির্যাতন বিপ্লবে লক্ষ করা যায় যে মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন শিশু নিরাপত্তার সংকটে। একটি সমাজে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতির বাইরে থাকা শিশুসন্তানও যদি নিরাপত্তার সংকটে নিপতিত হয়, তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটি শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ও বিদ্যালয়ে গিয়েও যদি নিরাপদ বোধ করতে না পারে, তাহলে সেই সমাজ ও জাতির কাছে সংশ্লিষ্ট শিশু ও অভিভাবকের আর কী চাওয়ার থাকতে পারে! বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ও বিদ্যালয়ে গিয়েও শিশু যখন লালিত, ধর্ষিত, নির্যাতিত কিংবা হত্যার শিকার হয় তখন একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজে নিজে লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। গত ২৪ আগস্ট রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের কিশোরী ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশা বখাটের ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পাঁচ দিন পর মৃত্যুবরণ করে। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই রিশাকে উত্ত্যক্ত করা হতো। এরই জের ধরে রিশা এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। শুধু রিশা নয়, দেশে এ রকম হাজারো রিশা নামের শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে উত্ত্যক্তের শিকার হয়। এ কারণে অনেক অভিভাবকই তাঁর কন্যাসন্তানকে নিয়ে বিপাকে পড়েন। অনেক সময় লালিত হয় ও সব শিশু। অভিভাবকরা লজ্জায় মুখ বন্ধ করে থাকেন। নিজের সন্তানের সম্মান রক্ষায় প্রতিবাদ করেন না। এমনকি বিদ্যালয়ের গতি না পেরোতেই শিশুসন্তানকে বিয়ে দিয়ে দেন। একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কোনো মা-বাবা এখন শান্তিতে থাকেন না। শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কর্মস্থলে গেলেও সর্বক্ষণ তাঁদের চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল শহরগুলোয় এ প্রবণতা এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে অনেক মা-বাবা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে ভয় পান। শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীরা উত্ত্যক্তের শিকার হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ

ক্ষেত্রে নীরব থাকতে বাধ্য হন মানসম্মানের ভয়ে। এ ছাড়া মেয়েশিশুদের উত্ত্যক্ত করা ও হয়রানি করে তার ডিডিওচিত্র সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে অহরহ। এর ফলে তারা সামাজিকভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হচ্ছে, যা অনেক সময় তাদের আত্মহত্যা প্ররোচিত করছে। এমনকি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেক কিশোরীকে। গত কয়েক দিন আগে চাঁদপুরে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের ৮০ টাকা ফি পরিশোধ করতে না পারায় শাস্তি ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। পরে লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে, দুঃখে ওই শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। এভাবে শিশুকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে গিয়েও অপমানিত কিংবা লালিত হয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি প্রকট হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে ইভ টিজিং নিয়ে সারা দেশে অনেক তোলপাড় হয়েছিল। ইভ টিজিং অনেকটা কম। তবে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমানে জঙ্গি ইস্যুতে দেশে তোলপাড় হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে জঙ্গি তৎপরতাও কমেছে। কিন্তু সমাজে যে নানা রকম অন্যায়, অবিচার, বর্বরতা ঘটেই চলেছে তার মূলোৎপাটন কেন সম্ভব হচ্ছে না? এটি এখন আমাদের প্রশ্ন। সমাজ কেন জেগে উঠছে না? আমরা কেন ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ করছি না? সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। ঝরে পড়ার হারও কমেছে। এমন সব ইতিবাচক পরিবর্তনের বিপরীতে শিশু অধিকার বিষয়ে কিছু কিছু খবরে হতাশ না হয়ে উপায় থাকছে না। বাংলাদেশে সংবিধানের আলোকে ১৯৭৪ সালে প্রণীত হয় শিশু আইন। ১৯৯৪ সালে শিশুনীতি করা হয়। ২০১৩ সালে সমন্বয়যোগী শিশু অধিকার আইন প্রণীত হয়। উল্লেখ্য, শিশু অধিকার বলতে বোঝায়, শিশুর বাঁচার গ্যারান্টি, যত্নের গ্যারান্টি, নিরাপত্তার গ্যারান্টি, আনন্দময় বিকাশের গ্যারান্টি, বৈষম্য না হওয়ার গ্যারান্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার গ্যারান্টি, শিশুশ্রম বন্ধের গ্যারান্টি, নারী-শিশুর সমঅধিকারের গ্যারান্টি প্রভৃতি। এসব গ্যারান্টি বাস্তবায়নের কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ রয়েছে যথেষ্ট। তবে এই গ্যারান্টিগুলো

বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের সবার। বিশেষ করে সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব বেশি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনার বাইরেও শিশু নির্যাতন ও হয়রানির চিত্র বিস্তৃত। শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের ১৯১টি দেশের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল ‘জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ’। এই সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সব দেশ সনদের বিধানগুলো বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ। এই সনদের তনুচ্ছেদ ২৬(১)-এ বলা হয়েছে, ‘অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র শিশুর সামাজিক বীমা সুবিধাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে এবং এই বিষয়টি কার্যকর করার জন্য নিজ দেশের আইন অনুসারে পূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবে।’ তনুচ্ছেদ ৩২(১)-এ বলা হয়েছে, ‘অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকার রক্ষা করবে। স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর অথবা শিশুর শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটায় অথবা বিপদ আশঙ্কা করে এমন কাজ যেন না হয় তার ব্যবস্থা নেবে।’ এ থেকে বোঝা যায় শিশুর অধিকার সংরক্ষণে মা-বাবার পাশাপাশি রাষ্ট্রের দায়িত্বও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের প্রতিকলনে প্রণীত ‘বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩’ অনুযায়ী প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় শিশু বোর্ড ও শিশু ডেস্ক গঠন এবং শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু এর যথাযথ বাস্তবায়ন এখনো সম্ভব হয়নি। একের পর এক শিশু আইন ও শিশু অধিকারসংবলিত নানা বিধিবিধান বাংলাদেশে প্রণীত হলেও শিশুহত্যা, অপহরণ, উত্ত্যক্তকরণ ও সামাজিক মাধ্যমে হয়রানি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেন বেড়ে চলেছে এর কারণ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আর তা করতে না পারলে সমাজের কোনো শিশুই বিদ্যালয়ে গিয়ে কিংবা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে নিরাপদ বোধ করবে না!

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com